بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ১০ অক্টোবর, ২০২৫ মোতাবেক ১০ ইখা, ১৪০৪ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মক্কা বিজয় শেষে মহানবী (সা.)-এর মদীনায় ফিরে আসার পরও তাঁকে (সা.) কতক অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছে, যেগুলোর কথা আমি বর্ণনা করব। সেগুলোর একটি হলো কায়েস বিন সা'দ বিন উবাদার অভিযান। এটি সুদা অভিমুখে অষ্টম হিজরী সনে সংঘটিত হয়। মহানবী (সা.) যখন জিরানা থেকে মদীনায় ফিরে আসেন, তখন তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণ করেন। যেমন তিনি মুহাজের বিন আবু উমাইয়াকে ইয়েমেনের রাজধানী সানায় এবং যিয়াদ বিন লাবিদকে হাজারামউত অঞ্চলে প্রেরণ করেন আর একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করেন যার সেনাপতি হিসেবে কায়েস বিন সা'দকে নিযুক্ত করেন। তিনি (সা.) কায়েস বিন সা'দকে চারশ লোকের সাথে পাঠিয়েছিলেন যেন তারা ইয়েমনের সুদা গোত্রের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছাতে পারে। অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী, মহানবী (সা.) তাদেরকে সুদা গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি এই বর্ণনা সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে সেই গোত্রের পক্ষ থেকে মুসলমানদের ক্ষতি করার সংবাদ এসে থাকবে, যার কারণে তিনি (সা.) এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। অর্থাৎ যদি এই খবর সঠিক হয় এবং বর্ণনা সঠিক হয়– তাহলে; অবশ্য প্রথম রেওয়ায়েতটি অধিক সঠিক বলে মনে হয়। বর্ণনা অনুযায়ী তিনি (সা.) এর জন্য একটি সাদা পতাকা বাঁধেন এবং একটি কালো ঝান্ডা তাদের হাতে তুলে দেন। তারা কানা উপত্যকার একপাশে শিবির স্থাপন করে। কানা উপত্যকা মদীনা এবং উহুদের মধবর্তী মদীনার তিনটি বিখ্যাত উপত্যকার একটি। হযরত কায়েস খাযরাজ গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন উবাদার পুত্র ছিলেন। হযরত কায়েস বিন সা'দ বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে গণ্য হতেন। মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) যখন হযরত সা'দ বিন উবাদার কাছ থেকে পতাকা ফেরত নিয়েছিলেন, তখন তার এই পুত্র কায়েসের হাতেই তা তুলে দিয়েছিলেন। তিনি সুচিন্তাশীল এবং সাহসী যোদ্ধা হিসেবে বিবেচিত হতেন আর উদারতা ও দানশীলতায়ও বিখ্যাত ছিলেন। হযরত কায়েস কানা উপত্যকায় শিবিরে অবস্থান করছিলেন, তখন সুদা গোত্রের এক ব্যক্তি যিয়াদ বিন হারেস সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এই ব্যক্তি কিছু সময় পূর্বে মুসলমান হয়েছিল। যখন সে জানতে পারে, এই সেনাবাহিনী তার গোত্রের ওপর আক্রমণ করতে যাচ্ছে, তখন সে আক্রমণে বিলম্ব হওয়া নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে। সে নিশ্চিতভাবে জানত, তার গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের ক্ষতি করতে চাইত আর তারা এখন সেটিরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এসেছে। যাহোক, যখন সে দেখল, তার গোত্রের ওপর আক্রমণ হতে যাচ্ছে, তখন সে সেখান থেকে সরাসরি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করে, আপনি যে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছেন সেটিকে ফিরিয়ে আনুন। আমি আমার জাতির জন্য নিশ্চয়তা প্রদান করছি এবং তাদের ইসলাম গ্রহণেরও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। অর্থাৎ একটি প্রতিশ্রুতি হলো, তারা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করবে না এবং ক্ষতি সাধন করবে না, আর অন্যটি হলো, ধীরে ধীরে তারা ইসলামও গ্রহণ করে নেবে। তিনি (সা.) তার কথা গ্রহণ করে সেনাবাহিনীকে

ফিরিয়ে নেন। এই ঘটনা থেকেও প্রমাণিত হয়, তিনি (সা.) অঞ্চল জয় বা মানুষকে পদানত করার জন্য সেনা পাঠান নি, বরং ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং মুসলিমদের সুরক্ষা ছিল লক্ষ্য। আর যেমনটি হযরত যিয়াদ বিন হারেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারা এর ওপর আমলও করেছিল এবং ধীরে ধীরে তার জাতির লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। যদি শুধুমাত্র জোরপূর্বক মুসলিম বানানো উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হতো না। সরাসরি বলা হতো, ইসলাম গ্রহণ করো, নতুবা (তোমাদের জন্য) রয়েছে তরবারি। যাহোক, এর পর তিনি যখন ধীরে ধীরে তবলীগ করেন, তখন তারাও ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। কেননা আক্রমণ করা এবং জোরপূর্বক মুসলমান বানানো তো ইসলামী শিক্ষারও পরিপন্থি এবং মহানবী (সা.)-এর নিজের আচরণ ও সুন্নতেরও বিরোধী। তাদের ইসলাম গ্রহণের পর মহানবী (সা.) হযরত যিয়াদকেই তাদের শাসক নিযুক্ত করেন এবং তিনি (সা.) তার জাতির জন্য একটি নিরাপত্তা স্মারকও লিখিয়ে দিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যায় তার জন্য নিরাপত্তা স্মারকের কোনো প্রয়োজন হয় না। তবে এটি লেখা হয়েছিল কারণ তাদের মধ্যে কেউ কেউ তখনও মুসলমান হয় নি।

বনু তামিম অভিমুখে হযরত উয়াইনা বিন হিসন ফাযারীর অভিযানেরও উল্লেখ বিদ্যমান রয়েছে। এই অভিযান হিজরী সনের মুহাররম মাসে বনু তামিম গোত্র অভিমুখে হযরত উয়াইনা বিন হিসনের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল। এর পটভূমি হলো, মহানবী (সা.) হযরত বিশর বিন সুফিয়ানকে খুযাআ গোত্রের বনু কাব শাখার প্রতি যাকাতের অর্থ আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই লোকেরা সুকিয়া এবং বনু তামিম-এর অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করত। তাই হযরত বিশর বিন সুফিয়ানের নির্দেশে বনু খুযাআর সম্পদ চতুর্দিক থেকে তার কাছে সংগৃহীত হতে থাকে। বনু তামিম, যারা তখনও মুসলমান হয় নি, তাদের কাছে এই সম্পদ অনেক বেশি মনে হয় আর তারা বলতে থাকে, এই লোক কেন বিনা অধিকারে আমাদের সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে? এবং তারা তাদের তলোয়ার বের করে নেয়। বনু খুযাআ বলে, আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং এটি আমাদের ধর্মের নির্দেশ। এই সম্পদ আমরা (স্বেচ্ছায়) দিচ্ছি। তোমাদের এতে কী সমস্যা? কিন্তু বনু তামিম বলে, এই বিশর বিন সুফিয়ান কোনো একটি উটও স্পর্শ করতে পারবে না। এই ঝগড়া এবং যুদ্ধের অবস্থা দেখে হযরত বিশর বিন সুফিয়ান কোনো কিছু সংগ্রহ না করেই সেখান থেকে ফিরে আসেন। এই বিষয়টি বনু খুযাআর জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক বিষয় ছিল। তাদের খুবই খারাপ লেগেছিল। বনু খুযাআ বনু তামিমের ওপর আক্রমণ করে এবং তাদেরকে এই বলে সেখান থেকে বের করে দেয় যে, যদি তোমাদের সাথে আমাদের আত্মীয়তা না থাকত তবে তোমরা তোমাদের শহর পর্যন্ত পৌঁছতে পারতে না। মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে আমাদের অবশ্যই কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, তোমাদের এই কথা বলা এবং আমাদের যাকাত না দিতে পারার কারণে। তোমরা মহনবী (সা.)-এর প্রতিনিধিকে অগ্রাহ্য করেছ এবং তাকে আমাদের সম্পদের যাকাত নিতে বাধা দিয়েছ।

অপরদিকে হযরত বিশর বিন সুফিয়ান মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে পুরো পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি (সা.) বলেন, এই গোত্রকে কে সমুচিত শিক্ষা দেবে? সবার আগে হযরত উয়াইনা বিন হিসন লাব্বায়েক (আমি হাজির আছি) বলে সাড়া দেন। মহানবী (সা.) হযরত উয়াইনা বিন হিসনকে পঞ্চাশজন আরব অশ্বারোহীসহ বনু তামিমের দিকে প্রেরণ করেন, যাদের মধ্যে মুহাজির এবং আনসারের মধ্য থেকে কেউই ছিল না। উয়াইনা তার সঙ্গীদের সাথে রওয়ানা হন। তারা রাতে সফর করতেন এবং দিনে লুকিয়ে

থাকতেন। অবশেষে তারা সেই মরুভূমিতে পৌঁছেন যেখানে বনু তামিম অবস্থান করছিল এবং তাদের পশুপাল চরাচ্ছিল। বনু তামিম এই বাহিনীকে দেখে নিজেদের সবকিছু ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তাদের এগারোজন পুরুষ, এগারোজন নারী এবং ত্রিশজন শিশু বন্দি হয়েছিল, যাদেরকে তারা মদীনায় নিয়ে আসেন এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে হযরত রামলা বিনতে হারেসের ঘরে রাখা হয়। পরবর্তীতে বনু তামিমের আশি বা নব্বইজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়। এই প্রতিনিধিদলে তাদের গোত্রের কতক বাগ্মী কবি এবং বক্তাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মসজিদে এমন সময় এসেছিল যখন লোকেরা যোহরের নামাযের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর অপেক্ষা করছিল। প্রতিনিধিদল ভেবেছিল যে, সম্ভবত তিনি (সা.) দেরি করেছেন, তাই তাদের মধ্যে কয়েকজন মহানবী (সা.)-এর কক্ষের কাছে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে ডাক দিয়ে বলতে থাকে যে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমাদের বাহিরে আসুন। তিনি (সা.) বাইরে আসেন। তখন এই লোকেরা মহানবী (সা.)-এর সাথে আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়। এরপর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যোহরের নামায পড়ান এবং নামায শেষ করে মসজিদের প্রাঙ্গণেই বসে পড়েন। প্রতিনিধিদলের নেতা বলে, আমরা কবিতা এবং বক্তৃতায় আপনার সামনে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাই। অর্থাৎ বক্তৃতা এবং কবিতায় আমাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন, যেন জানা যায়– কোন জাতির বক্তা এবং কবি উন্নত মানের। আমরা গর্বিত যে, আমাদের বক্তারাও দক্ষ এবং আমাদের কবিরাও দক্ষ। তিনি (সা.) বলেন, কবিতা এবং বক্তৃতা নিয়ে গর্ব করা আমার আগমনের উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ, আমি এজন্য আসি নি যে, আমার কবিতা এবং বক্তৃতা গর্বের সাথে উপস্থাপন করব। আমার উদ্দেশ্য তো কেবল আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানানো। কিন্তু তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য যদি এটাই হয়ে থাকে তাহলে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করো। অর্থাৎ, যদি তোমরা চাও তাহলে ঠিক আছে, প্রতিযোগিতা করে নাও; আমরা এর উত্তর দেবো। প্রতিনিধিদল তাদের বক্তা উতারেদ বিন হাজেবকে সামনে এগিয়ে দেয়। সে বক্তৃতা করে। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) হযরত সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাসকে এর উত্তর দিতে বলেন। তিনি তার প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য রাখেন যা সেই ব্যক্তির বক্তৃতার ওপর জয়যুক্ত হয়। হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত সেই সময় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। মহানবী (সা.) তাকে ডেকে পাঠান। এর পরে প্রতিনিধিদলের কবি যিবরিকান বিন বদর তার কবিতা উপস্থাপন করে। তারপর মহানবী (সা.) হাস্‌সানকে বলেন, তিনি যেন এর মোকাবিলায় নিজের কবিতা শোনান। হযরত হাস্‌সান এর তাৎক্ষণিক উত্তর প্রদান করেন। হযরত হাস্‌সানের শেষ করার পর প্রতিনিধিদলের লোকেরা পরস্পর একসাথে বসে পরামর্শ করে। তখন আকরা বিন হাবিস, যিনি এই প্রতিনিধিদলের সাথে এসেছিলেন, তিনি তার সঙ্গীদের সামনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মন্তব্য করেন, তাদের বক্তা আমাদের বক্তার চেয়ে ভালো এবং তাদের কবি আমাদের কবির চেয়ে অনেক বেশি উন্নত মানের। তারা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে আছে। এরপর যখন আলোচনা শেষ হয়, তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। কতক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আকরা বিন হাবিস কিছু সময় পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তখন তিনি প্রতিনিধিদলের সাথে পুনরায় উপস্থিত হয়েছিলেন। মহানবী (সা.) বনু তামিমের ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের বন্দিদের ফেরত পাঠিয়ে দেন এবং সবাইকে পুরস্কার ও সম্মান প্রদান করেন। একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে পাঁচশ করে দিরহাম প্রদান করা হয়। এই প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত উতারেদ বিন হাজেব, যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে, তিনি ইসলাম

গ্রহণের পর মহানবী (সা.)-এর সমীপে একটি চাদর উপহার হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন। এই চাদরটি তাকে কিসরা দিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, এটি খুবই উন্নত মানের একটি রেশমি চাদর ছিল যার ওপর সোনার কারুকাজ করা হয়েছিল। সাহাবীরা চাদরের সূক্ষ্মতা এবং কোমলতা দেখে অত্যন্ত অভিভূত হন এবং এটি নিজেদের হাতের পরশে অনুভবের চেষ্টা করেন। সাহাবীদের এই আচরণ দেখে তিনি (সা.) বলেন, তোমরা এই চাদরের ব্যাপারে এত আশ্চর্য হচ্ছো! জান্নাতে সা'দের চাদরগুলো এর থেকেও অনেক বেশি কোমল এবং অনেক বেশি ভালো।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও এই ঘটনার ওপর সার্বিকভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, এক দীর্ঘ সময় পরে যখন তাঁর (সা.) কাছে কোথাও থেকে কিছু রেশমি কাপড় উপহারস্বরূপ আসে, তখন কয়েকজন সাহাবী সেগুলোর কোমলতা এবং মসৃণতা দেখে বিস্ময়াভিভূত হন এবং এটিকে একটি অসাধারণ জিনিস হিসেবে জ্ঞান করেন। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা কি সেগুলোর কোমলতার ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করছ? আল্লাহ্‌র কসম! জান্নাতে সা'দের চাদরগুলো এর থেকে অনেক বেশি কোমল এবং অনেক বেশি ভালো। তাঁর (সা.) এই কথা রূপক ভাষায় ছিল যার মাঝে সা'দের সেই আরামদায়ক অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য ছিল, যা তিনি জান্নাতে লাভ করেছিলেন। অন্যথায়, যেমনটি পবিত্র কুরআন এবং হাদীস থেকে নীতিগতভাবে জানা যায়, জান্নাতের নিয়ামতসমূহের সাথে এই পৃথিবীর নিয়ামতগুলোর তুলনা করা যায় না। আমাদের পরিভাষানুযায়ী জান্নাতের নিয়ামতসমূহ পার্থিব বস্তুও আখ্যায়িত হতে পারে না। আর প্রকৃত বিষয় হলো, যে শব্দগুচ্ছ কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে শুধুমাত্র রূপকার্থে এবং তুলনা করতে গিয়ে নিয়ামতসমূহের উৎকর্ষের প্রতি ইঙ্গিত করাই হলো উদ্দেশ্য।

এরপর আরেকটি অভিযান হলো কুতবা বিন আমেরের যুদ্ধাভিযান– যা নবম হিজরীর সফর মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) হযরত কুতবা বিন আমের (রা.)-কে বিশজন সদস্যসহ খাসাম গোত্র অভিমুখে প্রেরণ করেন। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, তাদেরকে কুবালা-র আশপাশের অঞ্চলগুলোতে প্রেরণ করেছিলেন; ইয়েমেন যাবার পথে তিহামা এলাকায় কুবালা শহর অবস্থিত। মক্কা এবং এর মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো আট দিনের যা আনুমানিক ১৫৬ মাইল। এক বর্ণনানুযায়ী, বীশা-র আশপাশের এলাকায় তাদেরকে এই আদেশ দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন যে, অতর্কিতে তাদের ওপর আক্রমণ করবে। কেননা নিশ্চিতভাবে তারা অরাজকতা সৃষ্টি করছিল। পথিমধ্যে তারা এক ব্যক্তিকে আটক করেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে বোবা হবার ভান করে, কিন্তু সে গোত্রের বসবাসস্থলের নিকটবর্তী হতেই চিৎকার করে নিজ গোত্রকে সতর্ক করতে চেষ্টা করে। তার এই ধোঁকাবাজির কারণে তাকে হত্যা করা হয়। যেহেতু তখন গোত্রবাসী কিছুটা সতর্ক হয়ে যায় তাই রাত হবার অপেক্ষা করা হয়। যখন কিছুটা আঁধার নেমে আসে তখন মুসলমানরা তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে। তীব্র লড়াই হয় এবং উভয় পক্ষের বহু আহত হয় আর বিরোধী গোত্রের বহু লোক নিহত হয়। হযরত কুতবা (রা.) গনিমতের সম্পদের মাঝে উট, ছাগল এবং নারীদের মদীনায় নিয়ে আসেন। খুমুস পৃথক করার পর তাদের প্রত্যেকের ভাগে চারটি করে উট অথবা চল্লিশটি করে ছাগল আসে। যাহোক, নৈরাজ্য দমনের জন্য তাদেরকে এই আক্রমণ করতে হয়েছিল।

এরপর যাহহাক বিন সুফিয়ান কিলাবীর যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ রয়েছে। এটি কিলাব গোত্র অভিমুখে পরিচালিত হয়েছিল। এটি নবম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) হযরত যাহহাক বিন সুফিয়ান কিলাবী (রা.)-কে কুরতা এলাকায়

তার নিজ গোত্র বনু কিলাব অভিমুখে প্রেরণ করেন। কুরতা হলো বনু বকর গোত্রের একটি শাখা– যা মদীনা থেকে সাত দিনের দূরত্বে অবস্থিত। মুসলমানদের সাথে তাদের নাজদের যুল জালাওয়া নামক স্থানে সাক্ষাৎ হয়। তারা (তাদেরকে) ইসলামের বার্তা পৌঁছান; কিন্তু গোত্রবাসী অস্বীকার করে আর বিষয়টি লড়াই পর্যন্ত গড়ায়। তারা কুরতাবাসীকে পরাজিত করেন আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত করেন।

এই যুদ্ধাভিযানের একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা হলো, সালামা বিন কুরত নামক এক কাফির বিরোধী নেতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য তার ছেলে আসয়াদ বিন সালামা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি (রা.) মুসলমানদের পক্ষে সৈন্যদলের সাথে ছিলেন। শত্রুরা মুসলমানদের আক্রমণের তীব্রতা সইতে না পেরে পালিয়ে যাচ্ছিল, আর তাদের মাঝে হযরত আসয়াদ (রা.)-র পিতা সালামাও ছিল। হযরত আসয়াদ (রা.) তার পিতার পিছু ধাওয়া করেন সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিজের ঘোড়াসহ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনিও (রা.) তার পিছু পিছু যান আর পিতাকে পুনরায় ইসলামের দাওয়াত দেন, যেন যে-কোনো উপায়ে তার পিতা জাহান্নাম থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু পিতা প্রত্যুত্তরে পুত্রকে বকঝকা আরম্ভ করে। তিনি যখন দেখলেন তার পিতা ধৃষ্টতা ও বিদ্রোহী মনোভাবে অটল আছে, তখন পিতার ঘোড়ার পায়ের রগ কেটে দেন আর অপর এক ব্যক্তি এসে তাকে হত্যা করেন।

অবশ্য অপর এক বর্ণনানুযায়ী, হযরত আসয়াদ (রা.) যখন মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার বৃদ্ধ পিতা তাকে একটি পত্র লেখে। পত্রে কয়েকটি পঙ্‌ক্তিও ছিল, যার মাঝে সে নিজের বৃদ্ধ বয়সে স্বীয় পুত্রের অবাধ্যতার অনুযোগও করে আর পুত্রকে ইসলাম গ্রহণের জন্য তিরস্কারও করে লেখে, কী সেই বিষয়– যার কারণে তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতাকে পরিত্যাগ করেছ আর ইসলাম গ্রহণ করেছ? হযরত আসয়াদ (রা.) তার পিতার এই পত্র দেখে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে পিতার (পত্রের) উত্তর প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশক্রমে তিনি তার পিতাকে একটি তবলীগি পত্র লেখেন, যা পড়ে তাঁর পিতা ইসলাম গ্রহণ করেন। তাতে এই বর্ণনাও আছে।

এরপর জেদ্দা অভিমুখে হযরত আলকামা বিন মুজাযযিয (রা.)-র অভিযানের উল্লেখ রয়েছে। ইবনে সা'দ লিখেছেন, এই অভিযান নবম হিজরীর রবিউস সানী মাসে সংঘটিত হয়েছিল। কিছু বর্ণনানুযায়ী এটি নবম হিজরীর সফর মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) সংবাদ পান যে, হাবশার কিছু যুদ্ধবাজ ব্যক্তি জেদ্দার সমুদ্র উপকূলে অবস্থান নিয়েছে। কতক বর্ণনানুসারে তারা মক্কাবাসীদের এলাকায় ডাকাতি করতে চেয়েছিল। একটি গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তারা সমুদ্র অতিক্রম করে মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছিল। জেদ্দা মক্কা মুকাররমার পশ্চিম উপকূলীয় একটি শহর, যা আজও বিদ্যমান এবং এটি হেজাযের একটি বড়ো শহর। মক্কা থেকে জেদ্দার দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার, আর মদীনা থেকে জেদ্দার দূরত্ব প্রায় ২৫০ মাইল। মহানবী (সা.) হযরত আলকামা (রা.)-কে তিনশ লোকের নেতৃত্ব দিয়ে তাদের প্রতি প্রেরণ করেন। হাবশার যে-সকল লোক জেদ্দার সমুদ্র উপকূলে অবতরণ করেছিল, তারা হযরত আলকামা (রা.)-র আগমনের সংবাদ পেয়ে নিজেদের নৌকায় চড়ে সমুদ্রে পলায়ন করে। হযরত আলকামা (রা.) একটি দ্বীপ পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করেন।

এই অভিযানের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যা এভাবে বর্ণিত হয়েছে: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত আলকামা বিন মুজাযযিয (রা.)-কে একটি সৈন্যদলের সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং আমিও সেই সৈন্যদলে

ছিলাম। আমরা যখন আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাই এবং অভিযান শেষে যখন একটি দল দ্রুত ফিরে আসার জন্য তাদের আমীরের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তিনি তাদের অনুমতি প্রদান করেন আর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফাহ সাহমী (রা.)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন। তার প্রকৃতিতে রসিকতা করার অভ্যাস ছিল। তারা পথিমধ্যে যাত্রাবিরতি দেয়। এরপর তারা আগুন পোহানোর উদ্দেশ্যে আগুন প্রজ্বলিত করে। সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ সাহমী (রা.) তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের ওপর কি আমার এই অধিকার নেই যে, তোমরা আমার কথা শুনবে এবং মানবে? তারা বলেন, অবশ্যই, কেন নয়? তিনি বলেন, আমি তোমাদের যে আদেশ দেবো, তোমরা কি তা পালন করবে? তারা বলেন, হ্যাঁ (অবশ্যই)। তখন তিনি বলেন, আমি তোমাদের আদেশ দিচ্ছি– তোমরা এই আগুনে ঝাঁপ দাও। কিছু লোক উঠে দাঁড়ায় এবং ঝাঁপ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু যখন তিনি এটি অনুধাবনে করতে পারেন যে, তারা সত্যিই ঝাঁপ দেবেন, তখন তিনি তাদের বলেন, তোমরা ক্ষান্ত হও; আমি তো তোমাদের সাথে কেবল রসিকতা করছিলাম। ফিরে এসে তারা মহানবী (সা.)-কে এই ঘটনার উল্লেখ করলে মহানবী (সা.) বলেন, مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللّٰهِ فَلَا تُطِيعُوهُ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার আদেশ দেয়, তার আনুগত্য কোরো না। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, মহানবী (সা.) বলেন, لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার বিষয়ে কোনো আনুগত্য নেই; আনুগত্য তো কেবল সৎ ও ন্যায়সংগত কাজে নিহিত। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যখন এই ঘটনা মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি (সা.) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ অর্থাৎ যদি তারা তাতে (তথা আগুনে) প্রবেশ করত, তবে কিয়ামত পর্যন্ত তারা সেখান থেকে বের হতে পারত না। কেননা আনুগত্য তো কেবল সৎ ও ন্যায়সংগত কাজে নিহিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, শরীয়ত পরিপন্থি বিষয়গুলোতে আনুগত্য করতে হয় না। মহানবী (সা.) একবার এক সাহাবীকে একটি ছোটো সৈন্যদলের সেনাপতি হিসেবে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে তিনি কোনো একটি বিষয়ের আদেশ দিলে কতিপয় সাহাবী আমল করেন নি। এতে তিনি খুবই রাগান্বিত হন এবং বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে তোমাদের আমীর নিযুক্ত করেছেন এবং তিনি (সা.) এ-ও বলেছেন, যে আমার নিযুক্ত আমীরের আনুগত্য করবে সে আমার আনুগত্য করবে, আর যে তার অবাধ্যতা করবে সে আমার অবাধ্যতা করবে। আমি যেহেতু মহানবী (সা.)-এর প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছি, সেক্ষেত্রে কেন তোমরা আমার অবাধ্যতা করলে? এতে সাহাবীরা বলেন, আমরা আপনার আনুগত্য করব। তিনি বলেন, ঠিক আছে, আমি দেখতে চাই তোমরা আনুগত্য করো কি-না। এরপর তিনি আগুন প্রজ্বলিত করার নির্দেশ দেন। যখন আগুন জ্বলে ওঠে তখন তিনি সাহাবীদের বলেন, এতে ঝাঁপ দাও। কেউ কেউ তো প্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু অন্যরা তাদেরকে বিরত রাখেন এবং বলেন, শরীয়তসম্মত বিষয়ে আনুগত্য হয়ে থাকে, এরা শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। এভাবে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করা অবৈধ। আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো, আত্মহত্যা করা অনুচিত। যখন এ বিষয়টি মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি (সা.) তাদের পক্ষে মত দেন যারা বলেছিলেন, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া অবৈধ।

এরপর হযরত আলী (রা.)-র নেতৃত্বে বনু তাঈ গোত্রের ফুল্‌স অভিমুখে যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি নবম হিজরী সনের রবিউস সানী মাসে সংঘটিত হয়। ফুল্‌স ছিল নাজদ অঞ্চলের একটি প্রতিমা এবং তাঈ গোত্র এর উপাসনা করত। এর নামে উপহার-উপঢৌকন উৎসর্গ করার পাশাপাশি অস্ত্রও উৎসর্গ করত। মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে দেড়শ আনসারসহ বনু তাঈ-এর প্রতিমা ফুল্‌স ধ্বংস করার জন্য এই অভিযানে প্রেরণ করেন। তাদের কাছে একশ উট ও পঞ্চাশটি ঘোড়া ছিল। এই সেনাদলের বিশেষত্ব ছিল, হযরত আলী (রা.) ব্যতীত অন্যান্য সকল সদস্য ছিলেন আনসার; মুহাজির বা অন্যদের মধ্য থেকে কেউ ছিলেন না।

বনু তাঈ আরবের বিখ্যাত একটি গোত্র ছিল। এরা সিরিয়ার নিকটে বসবাস করত। তিনি (সা.) এই যুদ্ধাভিযানের জন্য হযরত আলী (রা.)-কে একটি কালো রঙের বড়ো পতাকা এবং সাদা রঙের একটি ছোটো পতাকা প্রদান করেন। হযরত আলী (রা.) ভোরবেলা আক্রমণ করেন এবং তাদের প্রতিমা ফুল্‌স ধ্বংস করেন। অসংখ্য বন্দি , সম্পদ ও গবাদিপশু হস্তগত হয়। এটি বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈ-এর গোত্র ছিল এবং বন্দিদের মাঝে হাতেম তাঈ-এর মেয়ে সাফানাও ছিল। হাতেম তাঈ-এর পুত্র আদী– যে গোত্রের নেতা ছিল– সে পালিয়ে যায় এবং সিরিয়া অভিমুখে পলায়ন করে। হযরত আবু কাতাদাকে (রা.) বন্দিদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং সম্পদ ও গবাদিপশুর দায়িত্ব দেওয়া হয় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আতীককে (রা.)। মহানবী (সা.)-এর জন্য খুমুস অর্থাৎ এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে অবশিষ্ট যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া হয়। তবে হাতেম তাঈ-এর কন্যা সাফানাকে তারা বণ্টন করেন নি; তাকে গ্রেফতার করে মদীনাতে নিয়ে আসেন। হাতেম তাঈ-এর কন্যা সাফানাকে অন্যান্য বন্দিদের সাথে মসজিদে নববীর দরজার পাশে একটি তাঁবুতে রাখা হয়। সাফানা খুব সাহসী ও বুদ্ধিমতী নারী ছিল। যখন মহানবী (সা.) তার তাঁবুর পাশ দিয়ে যান তখন সে মহানবী (সা.)-এর সম্মানে দাঁড়িয়ে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ভাই পালিয়ে গিয়েছে, যে আমার একমাত্র অভিভাবক ছিল। সুতরাং আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি দয়া করবেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, অভিভাবক কে ছিল? সে বলে, আদী বিন হাতেম তাঈ। তিনি (সা.) বলেন, সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল থেকে পালিয়ে গেছে? এই কথা বলে তিনি (সা.) সেখান থেকে চলে যান। পরের দিন যখন তিনি (সা.) সে স্থান অতিক্রম করছিলেন তখন সাফানা আগের দিনের কথার পুনরাবৃত্তি করে। তিনি (সা.) তাকে আগের দিনের উত্তর দিয়ে চলে যান আর সে হতাশ হয়ে যায়। তৃতীয় দিন মহানবী (সা.) যখন সেই তাঁবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর (সা.) পেছন পেছন হযরত আলী (রা.)-ও আসছিলেন। হযরত আলী (রা.) সাফানাকে ইশারা করেন যেন সে নিজের দাবি উপস্থাপন করে। সে তৎক্ষণাৎ সম্মানের সাথে দাঁড়িয়ে পুনরায় নিজের সেই আবেদন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করে। এতে তিনি (সা.) বলেন, আমি তোমার আবেদন গ্রহণ করছি, তুমি এখন স্বাধীন। কিন্তু এখান থেকে চলে যেতে তাড়াহুড়ো করবে না। যখন কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি পাওয়া যাবে, তখন তোমাকে তার সাথে তোমার ভাইয়ের কাছে সিরিয়া পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

এক বর্ণনানুযায়ী সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে তার প্রতি অনুগ্রহ করার আবেদন জানায়, অর্থাৎ তিনি যেন তাকে স্বাধীন করে দেন। এতে তিনি (সা.) তার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাকে মুক্ত করে দেন। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে, এর ফলে সে মুসলমান হয়ে যায়।

কয়েক দিন পর বনু কুযাআর কতিপয় লোক মদীনায় আসে, যাদের উদ্দেশ্য ছিল সিরিয়া যাওয়া। সাফানা তা অবগত হলে মহানবী (সা.)-এর নিকট আবেদন করে, এই লোকদের প্রতি তার আস্থা আছে, তাই তাকে তাদের সঙ্গে সিরিয়ায় যেতে দেওয়া হোক। মহানবী (সা.) তাকে অনুমতি দেন এবং তার জন্য কিছু কাপড়, বাহন এবং পাথেয় প্রদান করেন। সেখানে থেকে বিদায় নিয়ে সে সিরিয়ায় নিজের ভাই আদীর কাছে পৌঁছায়। সে যখন সেখানে পৌঁছে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে তখন তাকে কটাক্ষ করে বলে, তুমি তোমার স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসলে, আর তোমার বোন ও নিজের মানমর্যাদা সেখানেই জলাঞ্জলি দিয়ে আসলে? একথা শুনে ভাই ক্ষমা চায় ও লজ্জিত হয়। স্বল্পকাল পর আদী তার বোনকে জিজ্ঞাসা করে, এখন বলো তো, মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? সাফানা– যে মহানবী (সা.)-এর উত্তম চরিত্র দেখে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল– সে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমার মতে, যত দ্রুত সম্ভব তুমি তাঁর (সা.) কাছে চলে যাও। তিনি যদি সত্যিই নবী হন, তাহলে তাঁর কাছে যে ব্যক্তি দ্রুত যাবে সে-ই সফলকাম হবে; আর যদি তিনি কোনো বাদশা হন তাহলেও তোমার সম্মান-সম্ভ্রমে কোনো ক্ষতি হবে না। আদী বলে, এটা খুব ভালো পরামর্শ। এরপর সে দ্রুত রওয়ানা হয়ে মদীনায় পৌঁছে যায়। মহানবী (সা.) মসজিদে অবস্থান করছিলেন। আদী নিজের পরিচয় দেয়। মহানবী (সা.) তাকে সাথে করে বাড়ির দিকে রওয়ানা হন। পথে এক বৃদ্ধা আলাপচারিতার উদ্দেশ্যে কিংবা কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য মহানবী (সা.)-কে থামায়। মহানবী (সা.) সেই বৃদ্ধা মহিলার সাথে কথা বলার জন্য দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেন। আদী এটা দেখে মনে মনে ভাবে, এই ব্যক্তি তো রাজাবাদশা হতে পারেন না, যিনি এভাবে এক বৃদ্ধার কথায় থেমে গিয়েছেন। বাড়ি পৌঁছার পর মহানবী (সা.) যখন খেজুরের পাতা ভরা চামড়ার একটি গদি তাকে বসার জন্য দেন, তখন আদী নিবেদন করে, আপনি এর ওপর বসুন। কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, না, তুমি এর ওপর বসো; আর তিনি (সা.) নিজে মাটিতে বসে যান। এ দৃশ্য দেখে আদী আবারও ভাবে, আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় এ ব্যক্তি কোনো রাজা নন। এরপর মহানবী (সা.) তার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেন। তার ধর্ম ও ব্যক্তিগত বিষয়াদি সম্পর্কে কিছু কথা বলেন যেগুলোর মধ্যে কিছু বিষয় এমন ছিল, যা আদী ছাড়া আর কেউ জানত না। এসব শুনে আদীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়, তিনি সত্যিই রসূল। সে নিবেদন করে, আমি নিশ্চিত হলাম– আপনি সত্যই আল্লাহ্‌র রসূল; কারণ আপনাকে কিছু গোপন বিষয়েরও সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

হযরত আদী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, হে আদী! ইসলাম গ্রহণ করো; তুমি নিরাপদ থাকবে। আমি বললাম, আমি ইতোমধ্যে একটি ধর্মের অনুসারী। মহানবী (সা.) বলেন, আমি তোমার ধর্ম সম্বন্ধে তোমার চেয়ে ভালো জানি। আমি বললাম, আপনি আমার ধর্ম সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশি জানেন? এটি কীভাবে হতে পারে? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আমি তোমার ধর্ম সম্বন্ধে তোমার চেয়ে বেশি জানি। এরপর মহানবী (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি রুকুসী অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্ম এবং সাবী ধর্ম– এই দুইয়ের মাঝামাঝি বিশ্বাসে বিশ্বাসী নও? আমি বললাম, অবশ্যই। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি তোমার গোত্রের সর্দার নও? আমি বললাম, হ্যাঁ। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি সর্দার হবার কারণে গনিমতের এক-চতুর্থাংশ ধনসম্পদ নাও না? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি নিয়ে থাকি। মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের ধর্ম অনুযায়ী এভাবে নেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। একথা শুনে আমি ভীষণ লজ্জা ও অপমান অনুভব করলাম। তারপর মহানবী (সা.) বলেন, হে আদী! মুসলমানদের দরিদ্রতা সম্ভবত তোমাকে এ ধর্ম গ্রহণে বাধা দিচ্ছে। আল্লাহ্‌র কসম! শীঘ্রই

এত ধনসম্পদ প্রবাহিত হবে যে, তা নেবার লোক পাওয়া যাবে না। আর সম্ভবত শত্রুর আধিক্যও তোমাকে এ ধর্মে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে। [ইসলামের অনেক শত্রু, তাই হয়ত তুমি তা গ্রহণে বিরত থাকছ।] আল্লাহ্‌র কসম! অচিরেই তুমি মহিলাদের সম্পর্কে শুনতে পাবে, তারা **হীরা** (বর্তমান ইসরাঈলে সে সময়কার ত্রিভূজ এক গ্রাম বা শহর) থেকে নিজ উটে চড়ে নির্ভয়ে এই ঘর তথা কা'বা গৃহের তাওয়াফ করবে। আর সম্ভবত এই বিষয়টিও তোমার এই ধর্ম গ্রহণে বাধ সাধছে যে, রাজত্ব ও ক্ষমতা অন্য লোকদের হাতে রয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম! অচিরেই তুমি ব্যাবিলনের সাদা প্রাসাদগুলো সম্পর্কে শুনতে পাবে যে, এগুলো এদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে, তেমনিভাবে কিসরার (তথা পারস্য সম্রাটের) ধনভাণ্ডারও (তাদের জন্য) খুলে দেওয়া হবে। এ কথাটি তিনি (সা.) তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। আদী বলেন, মহানবী (সা.)-এর উত্তম আচরণ ও এসব বিষয় দেখে আমি মুসলমান হয়ে যাই। হযরত আদী (রা.) তার ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা নিজেই বর্ণনা করেন। তিনি এ-ও বলতেন, আমি মুসাফির মহিলাদের দেখেছি, যারা সঙ্গীহীন অবস্থায় হীরা থেকে যাত্রা করে বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফের জন্য আগমন করেছে। কিসরা বিজয়ী সেনাদলে আমিও ছিলাম। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আদী (রা.) ইসলামের বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালন করতেন। নামাযের জন্য সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকতেন। নামায পড়ার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ও সজাগ থাকতেন। যে-সব মানুষ বার বার প্রশ্ন করে, হজ্জের সময় মাহরাম (পুরুষ) আত্মীয়ের সাথে যাওয়া আবশ্যক কি-না; এ বিষয়ে কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা আবশ্যক ছিল, সে সম্পর্কে আমি কয়েকবার উত্তর দিয়েছি। কিন্তু এই ঘটনাটিও সেই কথা সমর্থন করে যে; হযরত আদী (রা.) বলেন, আমি নিজে দেখেছি– জনৈক মহিলা হীরা থেকে একা কা'বা তাওয়াফ করতে এসেছেন, তার সাথে আর কেউ ছিল না। অর্থাৎ মাহরাম আত্মীয় থাকার কোনো শর্ত ছিল না। হযরত আলী (রা.)-র এ অভিযানের কিছু সময় পর তাঈ গোত্রের প্রতিনিধিদল মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

এরপর উকাশা বিন মিহসান (রা.)-র অভিযানের কথা উল্লেখ করছি যা 'জানাব' অভিমুখে হয়েছিল। এ অভিযানটি নবম হিজরীর রবিউস সানী মাসে হয়েছিল। হযরত উকাশার এ অভিযানটি মদীনার উত্তর দিকে অবস্থিত 'উযরা' ও 'বালি' গোত্রের সাথে সংঘটিত হয়েছিল যারা 'জানাব'-এর আশপাশে বসবাস করত। কিছু বর্ণনায় এ স্থানের নাম 'জিবাব'-ও বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিতভাবে এ অভিযান সম্পর্কে বর্ণিত হয় নি। কেবল এতটুকু জানা যায় যে, এ অভিযানটি হয়েছিল।

এখন তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু কথা বর্ণনা করে দিই। নবম হিজরীর রজব মাসে অর্থাৎ ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এটি হয়েছিল। তায়েফের যুদ্ধের পর নবম হিজরীর রজব মাসে মহনবী (সা.) এ যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এটি মহানবী (সা.)-এর জীবনের শেষ যুদ্ধ ছিল। তাবুক মদীনা থেকে প্রায় ৬৫০ কি. মি. দূরে অবস্থিত। তাবুক নামের ঝরনার নিকট অবস্থান করার কারণে এ যুদ্ধকে তাবুকের যুদ্ধ বলা হয়। মহানবী (সা.) তাবুকের কাছে পৌঁছানোর পর কাফেলার সদস্যদের বলেন, انکم ستاتون غدا انشاءالله عین تبوک। অর্থাৎ আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ তোমরা তাবুকের ঝরনায় পৌঁছাবে। পবিত্র কুরআনে তাবুকের যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে 'সাআতুল উসর' অর্থাৎ কষ্টের সময় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্য এ যুদ্ধকে গাযওয়াতুল উসর-ও বলা হয়। কারণ এ যুদ্ধে মুসলমানদের অনেক প্রতিবন্ধকতা ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে, যেমন– প্রচণ্ড গরম, দূরের সফর,

বাহনের অনেক ঘাটতি এবং পথিমধ্যে পানির প্রবল সংকট ছিল; সেনাবাহিনীর প্রস্তুতির জন্য অর্থেরও অভাব ছিল এবং এসব সমস্যার বেশ সম্মুখীন হতে হয়। এসব কষ্টের কারণে এটিকে 'জায়শুল উসরা'-ও বলা হয়, অর্থাৎ অভাব ও কষ্ট-কবলিত সেনাদল। এ যুদ্ধকে 'গাযওয়াতুল ফাযিহা'-ও বলা হয়। আরবী ভাষায় 'ফাযাহাত' শব্দের অর্থ হলো অপমান ও পর্দা উন্মোচন করা। যেহেতু এ যুদ্ধের কারণে অনেক মুনাফিকের চেহারা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যা তাদের অধিক লাঞ্ছনা ও সম্মান খর্ব হবার কারণ হয়েছে– এজন্য এর এই নাম দেওয়া হয়েছে।

তাবুক যুদ্ধের কারণসমূহ এবং প্রেক্ষাপট কী ছিল? এমনিতে তো মদীনাবাসীদের জন্য সর্বদাই বহিঃশত্রুদের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে রোমানদের সমর্থনপুষ্ট বনু গাস্সানের পক্ষ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা থাকত আর এমন সংবাদও ছিল যে, রোমান ও গাস্সানি– উভয়ই কোনো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। গাস্সানিদের আক্রমণের আশঙ্কা এবং ভীতি সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) স্বয়ং বর্ণনা করেন, গাস্সানিদের পক্ষ থেকে সর্বদাই আমাদের ওপর আক্রমণের আশঙ্কা থাকত; অর্থাৎ সর্বদা এই ভীতি থাকত– এই বুঝি আক্রমণ হবে। তাবুক যুদ্ধের তাৎক্ষণিক যে কারণ ছিল সে সম্পর্কে একটি বর্ণনায় এসেছে, ব্যবসায়ীদের একটি দল যারা সিরিয়া থেকে মদীনায় জলপাইয়ের তেল নিয়ে এসেছিল– তারা মুসলমানদেরকে বলে, রোমানরা সিরিয়ায় অনেক বড়ো একটি সৈন্যবাহিনী একত্রিত করেছে এবং হিরাক্লিয়াস সেই সৈন্যবাহিনী ও মিত্রবাহিনীকে এক বছরের খরচ সরবরাহ করেছে। তাদের সাথে লাখাম, জুযাম, আমেলাহ্, গাস্সান ও অন্যান্য খ্রিষ্টান গোত্রগুলো যুক্ত হয়েছে এবং তাদের অগ্রগামী বাহিনী বালকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বালকা হচ্ছে সিরিয়ায় অবস্থিত একটি এলাকা যা দামেস্ক এবং ওয়াদিউল কুরার মাঝে অবস্থিত।

এই যুদ্ধের দ্বিতীয় কারণ এটিও ছিল যার উল্লেখ একটি বর্ণনাতে পাওয়া যায়; তা এমন যে, আরবের খ্রিষ্টানরা হিরাক্লিয়াসের কাছে লেখে, যে ব্যক্তি নবুওয়তের দাবি করেছে অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)– তিনি মারা গেছেন (নাউযুবিল্লাহ্) আর তার সাথিরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়েছে এবং তাদের সম্পদ ও পশুপাল ধ্বংস হয়ে গেছে। এখনই তাদের ওপর আক্রমণ করার ও খ্রিষ্টধর্মকে বিজয়ী করার এক মোক্ষম সুযোগ। সুতরাং সে তার সেনাপ্রধানকে চল্লিশ হাজার সৈন্যসহ প্রেরণ করে; সেই সেনাপ্রধানের নাম ছিল কাবায বা যান্নাদ। মহানবী (সা.) যখন এই সেনাদলের সংবাদ প্রাপ্ত হন তখন মহানবী (সা.)-ও সেনাদল প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন। এই যুদ্ধের মৌলিক কারণ এটিই জানা যায় যে, মক্কা বিজয়ের পর এবং হুনাইনের যুদ্ধে বনু হাওয়াযিনের মতো শক্তিশালী গোত্রের শোচনীয় পরাজয়ের পর ও আরবের আশপাশের এলাকার সবগুলো গোত্রের ওপর মুসলমানদের বিজয় লাভের পর ইহুদী, খ্রিষ্টান ও মুনাফিকরা আরো একবার একত্রিত হয় এবং নিজেদের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ হতে দেখে সেই সময়ের পরাশক্তি রোমান বাদশার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার সিদ্ধান্ত নেয়, আর এর জন্য তারা অনেক বড়ো এবং অনেক ভয়ংকর একটি পরিকল্পনা করে। একদিকে তারা রোমান বাদশার সাথে যোগাযোগ করে ও তাকে প্রস্তুত করে যেন সে তার সেনাবাহিনী প্রেরণ করে, যেন মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যায়। আর অপরদিকে মুনাফিকরা এমনটি করে যে, তারা মদীনায় পূর্ব থেকেই এই গুজব ছড়াতে শুরু করে– রোমান বাদশা তার সেনাদল প্রেরণ করছে যা মদীনায় মুহাম্মদ (সা.)-সহ সকল মুসলমানকে হত্যা করবে। এভাবে মুনাফিকরা এবং অন্য বিরোধীরা এটি চাচ্ছিল, খুব সম্ভব মহানবী (সা.) নিজেই এই সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য মদীনা থেকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন, এবং উভয় পরিস্থিতিতেই– তা যাত্রার কাঠিন্যই হোক কিংবা রোমান

বাদশার মোকাবিলাই হোক– মুসলমানদের এবং মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু নিশ্চিত করে ছাড়বে, (নাউযুবিল্লাহ্)। যাহোক, এটিই ছিল তাদের আকাঙ্ক্ষা। এর আরো বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব।

আজ রাবওয়ার গোলবাজারে অবস্থিত মসজিদুল মাহ্দীতে সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করে এবং সেখানে আমাদের পাঁচ-ছয়জন ব্যক্তি আহত হয়। দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন এবং তাদের অপারেশনও চলছিল। আল্লাহ্ করুন, তাদের অবস্থা যেন ভালো হয়ে যায়; অন্য আহতদের ওপরও আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করুন। কয়েকজন যারা গুরুতর আহত হয়েছেন তাদের পেটে গুলি লেগেছে। আক্রমণকারী এক সন্ত্রাসীকেও আমাদের নিরাপত্তারক্ষীরা হত্যা করেছে; আরেকজন পালিয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্ট এটুকুই, বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আসবে। আল্লাহ্ তা'লা এই সন্ত্রাসীদের, আইন ভঙ্গকারীদের এবং জামা'তের বিরুদ্ধবাদীদের অচিরেই ধৃত করুন। পাঞ্জাব সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং পাঞ্জাব সরকার এই দাবি করেছে যে, পাঞ্জাবের মধ্যে অপরাধ শতভাগ নিয়ন্ত্রণ হয়ে গেছে এবং এখন আর কোনো অপরাধী নেই। কিন্তু আহমদীদের ওপর প্রতিনিয়ত যে-সব আক্রমণ হচ্ছে, হত্যা ও শহীদ করা হচ্ছে অথবা আহত করা হচ্ছে এবং তাদের সহায়সম্পদে আগুন লাগানো হচ্ছে– এগুলোকে তারা হয়ত অপরাধই মনে করে না! আল্লাহ্ তা'লা এসব সরকারকেও বিবেকবুদ্ধি দান করুন এবং জামা'তের পক্ষে আল্লাহ্ তা'লা অতি দ্রুত নিদর্শন প্রদর্শন করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)